সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

পলান সরকার ও তাঁর পাঠাগার
মানুষ গড়ার কারিগর

দক্ষিণ এশীয় ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা নেটওয়ার্কের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক

সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা ১৪ জুলাই ২০২৩এ ব্রিটেনের লন্ডনস্থ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে South Asia Micro-Entrepreneurs Network শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্রামীণ উন্নয়ন, বিপণন এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় তার অন্তর্দৃষ্টির আলোকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: এমএফআই-এর জন্য এর অর্থ কী?' বিষয়টির ওপর তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্যে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৩ ● ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচি

পলান সরকার ও তাঁর পাঠাগার - ফাহমিদা জেসমিন	২
নতুন কারিকুলাম - ফাতিহুল কাদির সম্রাট	৬
স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন-২০২৩	৮
জ্ঞানের ফেরিওয়ালা - আলাউল হোসেন	১০
বাংলাদেশে সমাজকর্ম - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম	১২
চেতনায় স্বদেশ গণগ্রন্থাগার - হুমায়ুন কবির	১৪
শিক্ষা কি কেবলই চাকরিমুখী - অলোক আচার্য	১৬
সিদীপের বার্ষিক প্রোগাম মিটিং-২০২৩	১৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী	১৮
সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকে মৃত্যুবার্ষিকী	১৯
পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সিদীপ পরিদর্শন	২০
সামাজিক অভিশাপ যৌতুক - মায়িশা ফাহমিদা সুজানা	২২
সাফল্যগাথা	২৪
বই-আলোচনা	২৬

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' তার যাত্রার এক বছর পূর্ণ করেছে। "হাতে হাতে বই, আলোর যাত্রী হই" এই প্রতিশ্রুতি বুকে ধারণ করে ১১টি জেলায় সংস্থার কর্ম-এলাকায় অবস্থিত ২৫টি স্কুল/কলেজে এ পর্যন্ত মোট ২৫টি মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে পাঠ-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন করে ছাত্রছাত্রীকে বই পুরস্কার দেয়া হয়। এটি আমাদের একটি অত্যন্ত গর্বের কাজ। এছাড়াও পাঠাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে পাবনার কাশিনাথপুরে স্থানীয় পাঠাগার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এবার একটি স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। শিশু, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস বাড়িয়ে তাদের সৃজনশীল ও নৈতিক চিন্তা বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত আমাদের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষালোকে প্রতি সংখ্যায় কোনো না কোনো পাঠাগার নিয়ে লেখা প্রকাশ করে আমরা দেশজুড়ে বইপ্রেমী মানুষদের নানা বৈচিত্র্যময় প্রচেষ্টা তুলে ধরি। এবার তা আরও উজ্জ্বল হয়ে এসেছে। একুশে পদকপ্রাপ্ত 'বইদাদু' আলোর ফেরিওয়ালা পলান সরকারকে নিয়ে তাই এ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রধান রচনা।

আমাদের দেশে অনেক মানুষ সমাজকর্ম করে থাকেন। দেশজুড়ে বিভিন্ন মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাও তাই। সমাজকর্মকে সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ একটি স্বীকৃত পেশা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি লেখা ও সাক্ষাৎকার এসব কাজকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি লেখা চলতি সংখ্যাটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নিয়ে আছে একটি আলোচনা।

যৌতুকপ্রথার অভিশাপ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া গল্প, সিদীপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে চলতি সংখ্যাটিও পাঠকের মন কাড়বে বিশ্বাস করি।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

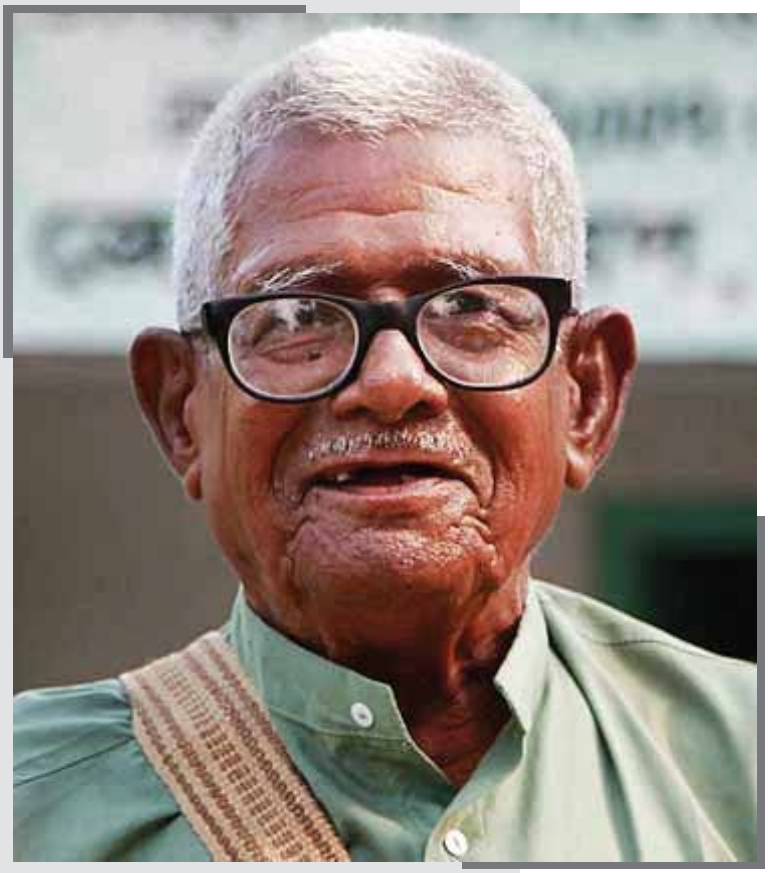

পলান সরকার ও তাঁর পাঠাগার

মানুষ গড়ার কারিগরের কথা

ফাহমিদা জেসমিন

পাঠাগার হচ্ছে সমাজ উন্নয়নের বাহন। জাতীর মেধা, মনন ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালনপালনকারী হিসেবে পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও সবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে বইপড়া ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও আলোকিত দেশে রূপান্তর করতে পারে। আমাদের মত দেশে পাঠাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়েও অনেক বেশি। একটি ভালো বই বর্তমান ও চিরদিনের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু। বইয়ের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বড় বড় মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। মানুষের জীবনে বই প্রকৃত ও একান্ত বন্ধু। সুখদুঃখ উভয় অবস্থাতেই বই প্রকৃত বন্ধুর মতই কাজ করে। বই যেমন চরিত্র গঠনে

সহায়তা করে, সদগুণাবলির অনুশীলনেও তেমনি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বইয়ের সাথে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। একটি সমাজের রূপরেখা বদলে দিতে পারে একটি পাঠাগার। গবেষকরা মনে করেন মনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পাঠাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই শহরের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। জাতির মেধা ও মনন বিকাশে এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ মেধাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার এলাকায় সরকারি উদ্যোগে একটি পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। এর নাম হচ্ছে "পলান সরকার পাঠাগার"।

রাজশাহীর পলান সরকার, বইয়ের ঝোলা কাঁধে নিয়ে নিজেই হয়েছিলেন ভ্রাম্যমান এক পাঠাগার। সবার মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ব্যক্তি উদ্যোগে শুরু করেন সামাজিক আন্দোলন। ভোরে বাড়ি থেকে বের হতেন, গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতেন, ঘুরে ঘুরে বিলি করতেন বই। এভাবে পলান সরকার গেল ৩০ বছরে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার ২২টি গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন বই পড়ার এক অভিনব আন্দোলন। তিনি লেখাপড়া করেননি বেশি। মাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। হারেজ উদ্দিন আসল নাম হলেও পলান সরকার নামেই তিনি পরিচিতি পান । সবাই 'বই দাদু' ডাকতেন তাকে। নিজের টাকায় বই কিনে পাঠকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ২০০৭ সালে সরকারিভাবে তার বাড়ির আঙিনায় একটি পাঠাগার তৈরি করে দেওয়া হয়।

প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্রামে বেরিয়ে পড়তেন একজন মানুষ। মাইলের পর মাইল হেঁটে একেক দিন একেক গ্রামে যেতেন। বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে আগের সপ্তাহের বই ফেরত নিয়ে নতুন বই দিতেন। রাজশাহীর প্রায় ২২টি গ্রামে তিনি ছড়িয়েছিলেন বইয়ের আলো। তিনি বলেছিলেন, আমার মধ্যে যদি উদ্যম বলে কিছু থাকে তবে আমি বইয়ের কাছে ঋণী।

বইয়ের সাথে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। একটি সমাজের রূপরেখা বদলে দিতে পারে একটি পাঠাগার। গবেষকরা মনে করেন মনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পাঠাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই শহরের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। জাতির মেধা ও মনন বিকাশে এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ মেধাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম

আলোর ফেরিওয়ালা: আলোর ফেরিওয়ালা বলতে যে আলো নিয়ে রাস্তায় ঘোরে এমনটা নয়। আলোর ফেরিওয়ালা পলান সরকার যিনি হাতে করে বা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বই নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে বয়স্ক, যুবক, শিশু সবাইকে একটি অভিনব বই পড়া আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন।

পলান সরকার ১৯২১ সালে নাটোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার নানার বাড়িতে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার অন্তর্গত বাউসা পূর্বপাড়া গ্রামে যান। সেখানে তিনি তার নানার জমি ও ব্যাবসা ইত্যাদি দেখাশোনা করেন এবং সেই জমির করের খাজনা তিনি উঠাতেন। এরপর তিনি সরকারি ট্যাক্স বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। নিজের ৫২ শতক জমি দিয়ে তৈরি করেছিলেন একটি উচ্চ বিদ্যালয়। তিনি নাটকের দলে কাজ করতেন যার ফলে তাকে বই পড়তে হতো, আর তখন থেকেই তার বই পড়া কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি নিজে বই পড়তেন ও বই পড়তে ভালোবাসতেন। তার সাথে যুক্ত করলেন বাউসা গ্রামের ১ম থেকে দশম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের এবং প্রত্যেকটি স্কুলে নতুন বছরে বিভিন্ন বই দেওয়া শুরু করেন।

১৯৯২ সালে ডাক্তার তাঁকে বললেন যে, তার ডায়াবেটিস হয়েছে, যদি বাঁচতে চান আপনাকে প্রতিনিয়ত নিয়ম করে হাঁটতে হবে। পলান সরকার কিছুদিন গ্রামেগঞ্জে হাঁটলেন আর তিনি দেখলেন এভাবে এমনি এমনি হাঁটতে তার ভালো লাগছে না। তারপর একদিন তার ঘর থেকে কিছু বই নিয়ে হাঁটতে চলে গেলেন এবং ঘুরেঘুরে বইপড়ুয়া মানুষদেরকে খুঁজে বের করলেন আর বইগুলো তাদেরকে দিলেন। তিনি প্রত্যেক সকালে গ্রামে যেতেন এবং সেই মানুষ যারা বই পড়তে ভালোবাসে না তাদেরকে বই পড়তে অনুপ্রেরণা দিতেন ও বই পড়তে আগ্রহী করে তুলতেন। বিশেষ করে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় যে গৃহবধূরা অল্প শিক্ষিত কিংবা কোন কারণে পড়াশোনা করতে পারেতন না সেইসব গৃহবধূকে সারা দিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বই পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। গ্রামের ছোট-বড় ছেলেমেয়েরা কেউ তাকে 'বইয়ের পোকা', 'বই পড়ুয়া দাদু' আবার কেউবা তাকে 'দুলাভাই' বলে সম্বোধন করতেন। কেউ তাকে দুলাভাই না বললে তাকে বই দিতেন না। তিনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন।

নিভৃতের অন্তরালে আলোকিত করা একজন মানুষ তিনি। তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন বিটিভির ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিচালক ও সঞ্চালক হানিফ সংকেত। সময়টা ছিল ২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর।

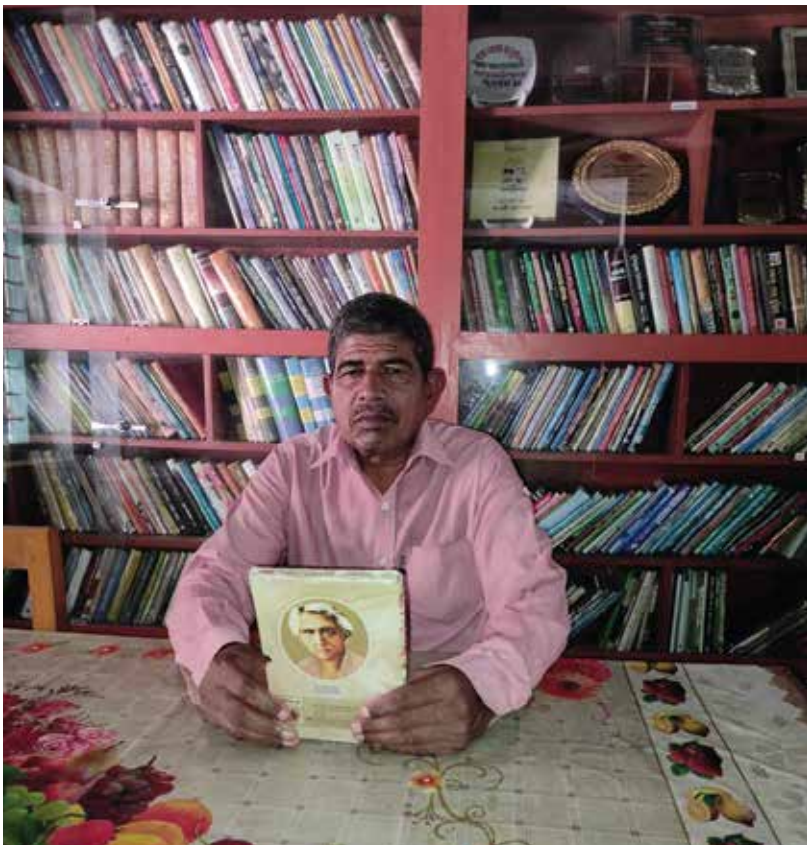

পলান সরকারের মেজো ছেলে হাবিবুর সরকার (গেদু)

তখন পলান সরকারকে দেখানো হলো সেই জনপ্রিয় "ইত্যাদি" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তারপর থেকে পলান সরকারকে সারা দেশের মানুষ জানতে শুরু করলেন। ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে অনেকগুলো বই উপহার দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর তাকে নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকের সাপ্তাহিক আয়োজনে ২০০৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি আরও একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে ইত্যাদিতে পলান সরকারকে তুলে ধরা এবং তাকে বই প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। 'ইত্যাদি' থেকে বই প্রদানের কারণে যেমন বইসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে বই পড়ার আন্দোলনও গতি পেয়েছে । ২০০৭ সালের ১৭ই এপ্রিল ইত্যাদিতে আরো একটি ফলোআপ অনুষ্ঠান করা হয়।

২০০৭ সালে প্রথম আলোর ছুটির দিনে পলান সরকার আসলেন। তার নামে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপা হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'বিনে পয়সায় বই বিলাই'।

২০১১ সালে পলান সরকারকে দেওয়াা হল 'একুশে পদক'।

আজকে একটি সফল পাঠাগার 'পলান সরকার পাঠাগার'-এর কথাই আলোচনা করছি।

পলান সরকার তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বাঘা উপজেলার ২২টি গ্রামে আলো ছড়িয়েছেন। তিনি জনগণ এবং তার নিজের প্রচেষ্টায় এই পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন ।

পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা: পলান সরকার যখন বই দিয়ে বেড়াতেন তখন তার বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০-৮০০টি। তারপর যখন দেখলেন দিনদিন পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে তখন তিনি আরো কিছু বই কিনলেন। তখন তার বইয়ের সংখ্যা হয়েছিল ২০০০এর মত। পরবর্তীতে তিনি যখন বিভিন্ন মিডিয়াতে তখন তার বইয়ের সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। একসময় পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা ৭০০০এরও বেশি হয়। পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে তিনি নাম রেজিস্টার না করেই মানুষের মাঝে বই বিতরণ করেছিলেন। তাই তখন অনেক বই তিনি ফেরত পাননি। বর্তমানে পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা আনুমানিক ৬ হাজারের মতো।

পাঠকের সংখ্যা: পাঠাগারে সংরক্ষিত রেজিস্টার অনুযায়ী পাঠাগারটিতে প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ জন বই নেয়। অর্থাৎ মাসে ৫০০-৬০০টি বই পাঠাগার থেকে নিয়ে যায় এবং মানুষ পড়ে। এছাড়াও পাঠাগারটির সামনে বাউসা ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজ থাকায় প্রতিদিনই শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে পাঠাগারে বসে বই পড়ে সময় কাটায়। আমি পাঠাগারে গিয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধ লোক পাঠাগারে বসে বই পড়ছেন। বয়স আনুমানিক ৬০-৬৫ বছর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কী বই পড়ছেন? তিনি বললেন, আমি পুলিশের চাকরি করতাম, অবসরপ্রাপ্ত হয়েছি। বাড়িতে সময় কাটে না, তাই এখানে এসে বই পড়লে বইয়ের ভাষার মধ্যে ডুবে থাকি, ভালো লাগে। আমি এখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়ছি ।

পাঠাগারে বিভিন্ন ধরনের বই বিভিন্ন তাকে সাজানো আছে এবং একটি ছোট কাগজের টুকরো দিয়ে নাম লিখে আঠা দিয়ে তাকের সাথে লাগানো আছে। এতে কোন ধরনের বই, কোন লেখকের বই তা শনাক্ত করা যায়।

পাঠাগারটিতে কর্মরত ব্যক্তির সংখ্য: পলান সরকার যখন বেঁচে ছিলেন তখন এর রক্ষণাবেক্ষণ তিনি নিজেই করতেন এবং সাথে তার পরিচিত দুই-একজন তাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার মেজো ছেলে হাবিবুর সরকার (ডাক নাম গেদু) পাঠাগারের দায়িত্ব পালন করেন। পলান সরকারের মোট ১০ জন ছেলে-মেয়ে। ৩ জন মেয়ে ও ৭ জন ছেলে। এদের মধ্যে তার মেজো ছেলে গেদু, শখ

হিসেবে তিনি একাই বাবার পাঠাগারের দায়িত্ব নিয়েছেন। পাঠাগারটি সকাল ৯টায় খোলা হয় এবং বিকেল ৪টায় বন্ধ করা হয়। তিনিই পাঠাগারটি নিয়মিত পরিষ্কার করেন। পাঠকের নাম, মোবাইল নম্বর, বইয়ের নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি রেজিস্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। হাবিবুর সরকার গেদুর সাথে সহযোগিতা করেন তার স্ত্রী।

পাঠাগার সম্পর্কে আমার মন্তব্য: ২০০৭ সালে যখন পলান সরকার পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমি প্রায়ই এই পাঠাগারটিতে বই নেওয়ার জন্য যাওয়া আসা করতাম। প্রতি বছরই যারা স্কুলে ১ম, ২য় এবং ৩য় হতো পলান দাদু নিজ হাতে তাদের পুরস্কৃত করতেন। এমনকি যে সব শিক্ষার্থী A+ বা জিপিএ ৫ পেতো তাদেরকে বই উপহার দিতেন। আমার মনে আছে, ২০১৩ সালে আমি যখন জিপিএ ৫ পাই, আমিও একটি বই উপহার পেয়েছিলাম।

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির মন্তব্য: ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে পলান সরকারের পাঠাগারে যাই। প্রথমে পলান সরকারের মেজো ছেলে হাবিবুর সরকার গেদুকে দেখতে পাই যিনি পাঠাগারে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার আব্বার স্মৃতি ধরে রাখতে শখ হিসেবেই আমি পাঠাগারটির দায়িত্ব নিই। তিনি নিজের টাকায় বই বিলি করতেন আজকে তার এতবড় অবদান এই লাইব্রেরি। আমি দেখেছি তিনি শখের বসেই পায়ে হেঁটে মানুষকে বই দিয়ে বেড়াতেন। আমার আব্বার মতো তো আমি হতে পারবো না। তাই চেষ্টা করি আব্বার এই শেষ স্মৃতিটি ধরে রাখতে পারি কিনা।

এর কিছুক্ষণ পরে কামরুল ইসলাম নামে একজন বই নিতে আসেন লাইব্রেরিতে। তার কাছে লাইব্রেরিটি সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি এই লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক। পেশায় আমি নাটোর বাগাতিপাড়া বিএম কলেজের শিক্ষক। বাড়ি বাউসা দাঁড়পাড়া। পলান সরকারকে আমি দাদু বলে ডাকি। আমি দেখেছি তিনি যখন আমাদের পাড়ায় বই নিয়ে যেতেন তখন তিনি বলতেন আমাকে দুলাভাই না বললে আমি কাউকে বই দিবো না তাই সবাই তাকে বইদাদু দুলাভাই বলে ডাকতো। আসলেই তিনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন। এখানে এই পাঠাগারে আসি মনের আনন্দে। বই পড়তে ভালোবাসি। আসলে আমার বই পড়া পলান সরকার দাদু থেকে শুরু হয়েছিল।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মী মনিরা জামান মিঠি বলেন, 'আমার আশা থাকবে যে, নতুন প্রজন্ম এখন পলান সরকারের জায়গাটাকে ধরে রাখবে এবং নতুন আরো কাউকে সে জায়গাতে প্রতিস্থাপন করে এই কার্যক্রমটা অব্যাহত রাখবে।'

গ্রামেগঞ্জে অনেক শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন। তারা যদি পলান সরকারের মতো এরকম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন তাহলে গ্রামেগঞ্জে অনেক লাইব্রেরি গড়ে উঠতে পারে। মোজাম্মেল হোসেন বকুল নামে স্থানীয় এক গ্রামের বাসিন্দা এই কথা বললেন।

বাংলা সাহিত্যের এক সম্ভার ছিলো পলান সরকারের কাছে। তার পাঠাগারের পাঠক ছিলেন ছেলে থেকে বুড়ো। বাদ যায়নি নারীরাও। অনেকের স্মৃতিতে বারবার ফিরছেন বিনা পয়সায় বই বিলানো মানুষটি। ৮৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটির মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন মানুষের স্মৃতির পাতায় থাকবেন। ■

লেখক: রাজশাহী জেলায় সিদীপের বাঘা ব্রাঞ্চের শিক্ষাসুপারভাইজার।

পলান সরকার পাঠাগারের সামনে লেখক

নতুন কারিকুলাম: বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

ফাতিহুল কাদির সম্রাট

আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের পর অবশেষে যাত্রা শুরু করেছে নতুন কারিকুলাম। ২০২২ সালে এটি চালু হওয়ার কথা থাকলেও করোনা বিপত্তির কারণে একবছর পিছিয়ে যায় এর প্রায়োগিক কার্যক্রম। করোনার কারণেই যতগুলো স্কুলে পাইলটিং করার কথা ছিল, ততগুলোতে করা সম্ভব হয়নি। ফলে সার্বিক মূল্যায়ন ও প্রস্তুতিতে খানিকটা ঘাটতি নিয়েই নতুন কারিকুলামের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

অবশেষে ২০২৩ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ধাপ শুরু করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনা। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা যাতে এসডিজি-৪ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। বিশ্বায়নের কালে বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানে চালিত করার জন্যে শিক্ষাকে বিশ্বমানে উত্তীর্ণ করার কোনো বিকল্প নেই। এখনকার ছেলেমেয়েরা বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা। তাদের জীবন বৈশ্বিক পটভূমির প্রতিযোগিতায় পরিব্যাপ্ত। তাদের কর্মসুযোগ ও বিচরণ বিশ্বায়ত। তাই আমাদের কারিকুলাম তথা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। সরকার এই প্রয়োজনীয়তাকে আমলে নিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাকার্যক্রম অনেকখানি একঘেঁয়ে ও জবরদস্তিমূলক। পুঁথিগতবিদ্যার চর্বিতচর্বণ ও পুঁথিভারে বিপর্যস্ত এবং পরীক্ষার পীড়নে নাকাল আমাদের শিক্ষার্থীরা। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত আনন্দের অনুষঙ্গ। নতুন কারিকুলাম পরিকল্পনায় শিক্ষাকে আনন্দঘন করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তকের বোঝা এবং পরীক্ষার চাপ কমানো হবে। মুখস্থবিদ্যার বদলে গভীর শিখনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এখন থেকে পুঁথিগতবিদ্যার ওপর নির্ভরতার বদলে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও অনুশীলন কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ক্লাস শেষে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো সময় কাটাতে পারে সেজন্যে বাড়ির কাজসহ গৃহকেন্দ্রিক পড়াশোনা, যা শিশুনির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে, তার নিরোধ নিশ্চিত করা হবে। জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে শিশুরা যেন সমন্বিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার ওপর জোর দেওয়া দেয়া হবে। ২০২৩ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের আওতায় এসেছে। ২০২৪ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণি এ শিক্ষাক্রমের আওতায় আসবে। ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণি যুক্ত হবে। ২০২৬ সালে একাদশ ও ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। এ কালিকুলাম অনুযায়ী দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে একমুখী। একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে শাখাভিত্তিক বিভক্তি আসবে।

নতুন কারিকুলামে মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির শিখনফল মূল্যায়ন উঠে যাচ্ছে। গতানুগতিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষাও থাকছে না। থাকছে না প্রচলিত ধারার ফলাফল নির্দেশকও। মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের কাজের বা পারফম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হচ্ছে। যেসব শিক্ষার্থী খুব ভালো করতে পারবে তাদেরকে ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে, যারা মোটামুটি ভালো তাদেরকে বৃত্ত দিয়ে, আর যাদের ভালো করতে হলে অধিকতর যত্নের প্রয়োজন, তাদেরকে চতুর্ভুজ দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রতি বছর দুটি মূল্যায়ন হবে। এ পদ্ধতিতে আগের মতো গৎবাঁধা মুখস্থবিদ্যা উগরে দেওয়ার সুযোগ নেই। উত্তরপত্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা ধর্তব্য কিছু নয়। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিমাপ করা হবে এ ব্যবস্থায়। যোগ্যতা ও দক্ষতায় যারা পেরে উঠবে না তাদের জন্যেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে ক্লাস রুটিনে লার্নিং লস বা রেমিডিয়াল (সংশোধনমূলক) ক্লাস করানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের চিহ্নিত করে আলাদাভাবে ক্লাস করানোর দায়িত্ব শ্রেণিশিক্ষকদের। সেটি যথাযথভাবে করা হলে কেউ পিছিয়ে পড়বে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মহল।

সামগ্রিক বিবেচনায় দক্ষতাভিত্তিক এ পদ্ধতির মূল্যায়ন অংশে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ৫টি বিষয়ে ৬০ শতাংশ শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ৪০ শতাংশ সামষ্টিক মূল্যায়ন, আর বাকি ৫টি বিষয়ে শতভাগই শিখনকালীন মূল্যায়ন। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো সামষ্টিক মূল্যায়ন থাকছে না। শিখনকালীন মূল্যায়নে গুরুত্ব দিয়ে বহুমুখী মূল্যায়ন যেমন- সতীর্থ মূল্যায়ন ও অংশীজন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের সূচনা করা হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, হাতে-কলমে কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর ও পারদর্শী স্তর -এ তিনটি ধাপে ফল প্রকাশ করা হবে। এক্ষেত্রে এই নম্বর বা গ্রেডবিহীন দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন পাবলিক পরীক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় কীভাবে সমন্বয় হবে, তা নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে আরো স্পষ্টীকরণ জরুরি। দক্ষতার স্তর বিবেচনায়

শিক্ষার্থী পরবর্তী ক্লাসে যাবে নাকি আগের ক্লাসে থাকবে, তা-ও স্পষ্ট হওয়া দরকার বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে দশটি শিখনক্ষেত্র চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা এবং যোগ্যতা বা দক্ষতা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক দক্ষতাসমূহ কোন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে করা হবে তা-ও টিচার্স গাইডে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গাইড অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে বেশ সুফল পেয়েছে বলে প্রমাণিত।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কারিকুলাম বাস্তবায়ন করা সত্যি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আসলে একটি শিক্ষাক্রম থেকে তাত্ত্বিকভাবে বর্ণিত সুফল পাওয়া নির্ভর করে তার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর, যা হয়ে থাকে শিক্ষকদের হাত ধরে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক হলেন সবকিছুর প্রাণ। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা নিশ্চিত করা। নতুন পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে তা বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উচ্চাশা পোষণ করা কঠিন। কারণ পদ্ধতি পরিবর্তন করা গেলেও বিদ্যমান শিক্ষকদের পরিবর্তন করা যাবে না। কাউকে বাদও দেওয়া যাবে না। নানা কারণে, নানাভাবে আমাদের শিক্ষকদের পেশাদারত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। এই বাস্তবতায় শিক্ষকদের মাইন্ডসেট কীভাবে পরিবর্তন করা হবে, তাদের মাঝে নতুনকে নিয়ে এগিয়ে চলার চেতনা কীভাবে জাগিয়ে তোলা হবে সেটি একটি বিবেচনার বিষয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মানসচেতনার পরিবর্তন করা সম্ভব কি-না সেটি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এটি প্রমাণিত যে, শিক্ষকসমাজ প্রচলিত পদ্ধতিকেই আঁকড়ে পড়ে থাকতে ভালোবাসেন। এই পেছনমুখী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে শিক্ষকদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক শিক্ষক নতুন কারিকুলামের ব্যাপারে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করছেন। নতুন

> নতুন কারিকুলাম পরিকল্পনায় শিক্ষাকে আনন্দঘন করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তকের বোঝা এবং পরীক্ষার চাপ কমানো হবে। মুখস্থবিদ্যার বদলে গভীর শিখনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এখন থেকে পুঁথিগতবিদ্যার ওপর নির্ভরতার বদলে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

পদ্ধতির সাথে অভিযোজিত হওয়ার বদলে এর প্রতি নাখোশভাব প্রদর্শর করার মানসিকতা থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যেহেতু একমুখী লেকচার মেথড এখন আর কাজ করবে না বরং পার্টিসিপেটরি বা অংশগ্রহণমূলক এপ্রোচ এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তাই শিক্ষকদের পড়ানোর বদলে পারফর্ম করার মানসিকতা ধারণ করতে হবে।

নতুন কারিকুলাম নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন ও অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সাধারণ অভিভাবকদের কাছে অনেক কিছুই গোলমেলে মনে হচ্ছে। জুন মাসে প্রথম প্রান্তিকের মূল্যায়ন হবার পর অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মূল কারণ তাদের দরকারি জ্ঞানের অভাব। নতুন এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে তারা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ আর বৃত্তের গোলকধাঁধায় পড়ে গেছেন বলে অনেকের অভিমত। অভিভাবকদের অভিযোগ, ক্লাসের গ্রুপভিত্তিক শিখন কৌশলে পিছিয়ে পড়বে দুর্বল শিক্ষার্থীরা। একইসাথে নির্দিষ্ট প্রশ্নকাঠামো না থাকায় মুল্যায়ন প্রস্তুতিতে স্কুলে কিংবা বাসাবাড়িতে কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগী হচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবীরা ভালো করলেও মেধায় দুর্বল শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আরো পিছিয়ে পড়বে বলে তাদের অভিমত। যেহেতু এ শিক্ষাক্রমে শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন প্রাধান্য পাচ্ছে তাই স্কুলের শ্রেণিকক্ষগুলো হতে হবে আকর্ষণীয়। থাকতে হবে আধুনিক শিক্ষা-উপকরণ। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হতে হবে যৌক্তিক। শিক্ষাপ্রশাসনকে ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও আধুনিক উপকরণ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

শুধু পদ্ধতি ভালো হলেই হবে না, তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাটা জরুরি। প্রথাগত ইংরেজি পঠনপাঠন থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিকেটিভ পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সে পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। একই কথা খাটে সৃজনশীল পদ্ধতির বেলাতেও। অনেকের ধারণা, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে বরং ধ্বংসই করছে। সৃজনশীল ও কমিউনিকেটিভ পদ্ধতি উন্নতবিশ্বে কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও আমাদের দেশে সুফল না দেওয়ার মূল কারণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উন্নাসিকতা।

আমরা আশা করব, নতুন কারিকুলাম ব্যর্থ হবে না বরং লক্ষ্যাভিসারী হয়ে উঠবে। শিক্ষাপ্রশাসন নিয়মিত ফিডব্যাক যাচাইয়ের মাধ্যমে এর প্রতিবন্ধকতা এবং দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত ও অপসারণ করে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। ■

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ও প্রয়াসের উদ্যোগে

স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন ২০২৩

সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' ও স্থানীয় 'প্রয়াস' পাঠগারের যৌথ আয়োজনে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুরে ১৭ জুন অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন-২০২৩। কাশিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলনকক্ষে দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান হয়। এতে পাবনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পনেরটি পাঠাগারের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক মফিদুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে ও সহযোগী অধ্যাপক মাহবুব হোসেনের সঞ্চালনায় এক আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল ও ডিজিটাল স্কুলের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বই ও পাঠাগার নিয়ে বিশেষ আলোচনা। লেখক আলমগীর খানের সভাপতিত্বে ও সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলমের সঞ্চালনায় পাঠাগার আন্দোলন, সংকট, উত্তরণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পাবনা সরকারি বুলবুল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মীর মঞ্জুর এলাহী, কথাসাহিত্যিক আখতার জামান, কবি সৈকত হাবিব, সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আব্দুছ ছাত্তার খান, শিক্ষাবিদ গোলাম রসুল, কবি ও গীতিকার হুমায়ূন কবীর।

এই সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক ছিলো জ্ঞানের ফেরিওয়ালা বলে খ্যাত বর্ষীয়ান পাঠাগার-ব্যক্তিত্ব এম এল নজরুল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান। সম্মাননাপত্রটি পাঠ করে শোনান কবি ও গীতিকার আলাউল হোসেন এবং এটি তাঁর হাতে তুলে দেন জনাব মীর মঞ্জুর এলাহী।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে পাবনা জেলার পাঠাগারসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপিত হলো। দেশকে এগিয়ে নিতে, জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ গড়তে নতুন প্রজন্মকে বইপাঠে অভ্যস্ত ও পাঠাগারমুখী হতে হবে। তাঁরা আরও বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে পাঠাগার হতে পারে গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। সবার চিন্তাচেতনাকে সঠিক পথে ধাবিত করতে পাঠাগার যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

জ্ঞানের ফেরিওয়ালা পাঠাগারযোদ্ধা

এম এল নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা

আলাউল হোসেন

সম্মাননা গ্রহণ করছেন এম এল নজরুল ইসলাম (সর্বডানে)

'বই হোক সমাজ গঠনের হাতিয়ার' এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে আপনি আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ঠিক কত বছর বয়স থেকে আপনি এই পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন আমি তা বলতে পারবো না। তবে আমরা কাশীনাথপুরে আপনাকে পেয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে। প্রতি শুক্রবার ফুলবাগান মোড়ে চেয়ার-টেবিল-মাইক ভাড়া করে এলাকার শিশু-কিশোরদের নিয়ে কচিকাঁচার আসর করতেন–সে দৃশ্য এখনও আমাদের চোখের কোণে ভেসে বেড়ায়।

হে আলোর দিশারি,
আপনার সম্পর্কে আমরা যদ্দুর জেনেছি, শৈশব থেকেই বই পড়ার পোকা ছিলেন আপনি। ঢাকার সরকারি বাংলা কলেজে অধ্যয়নকালীন আপনার সুযোগ হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ছাড়াও প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, লেখক শাহেদ আলী, প্রফেসর আশরাফ ফারুকীসহ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মেশার। তাঁরা তখন অবৈতনিক নৈশকালীন ক্লাস করাতেন বাংলা কলেজে। আপনার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের সাহচর্যে যাওয়ার ও স্নেহভাজন হওয়ার। বইপড়ার এবং লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রতি তীব্র আগ্রহ আরও গভীরভাবে আপনার মাথায় চেপে বসে তখন থেকেই। বাংলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে অর্থাভাবে ও পারিবারিক সমস্যার কারণে লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। তখন চাকরি শুরু করেন মুভী ফিল্মস কর্পোরেশনে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে ১৯৬৯ সালে ঢাকার মুগদাপাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে গড়ে তোলেন মৌচাক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। বই পড়তে ইচ্ছুক কিন্তু পাঠাগারে যাওয়ার সময় ছিল না যাদের, তাদের জন্যই আপনি এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বুকশেলফসহ বড় ধরনের ভ্যান গাড়িতে করে ঢাকার বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পাঠকদের পছন্দমত বই আদান-প্রদান করতেন মৌচাক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে। আপনার এই অনন্য প্রচেষ্টায় তখন ঢাকায় হাজার হাজার নতুন পাঠক সৃষ্টি হয়েছিল। এর মাঝেও আপনি বাংলাদেশের ৩টি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার ও ৫টি সিনেমার সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮৭ সালে পাবনার কাশীনাথপুরে আপনি নিজ উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে একটি ভাড়া ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তরণ লাইব্রেরি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এলাকায় হাজার হাজার পাঠক সৃষ্টি করেছেন আপনি। অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেও একটানা ৩০ বছর সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে পাঠাগার পরিচালনা করেছেন। পাঠাগারটি আপনার নিজস্ব জমিতে আধাপাকা ভবনে রূপান্তরিত করেছেন।

হে শ্রদ্ধেয়জন,
আপনাকে নিয়ে ২০১৪ সালে দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় 'বইপাগল এম এল নজরুল ইসলাম ৫০ বছর ধরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম। প্রতিবেদনটি প্রকাশের এক সপ্তাহ পরেই আমার হাতে ডাকযোগে একটি চিঠি এসে পৌঁছে। ছয় পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই চিঠির কয়েক লাইন আপনাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কেননা, আমার কাছে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বলে মনে হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে শৈশবে হারিয়ে ফেলা এক বন্ধু ৫০ বছর পরে আপনাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। চিঠির একাংশ–

'এম এল নজরুল ইসলামের সাথে সরাসরি পত্র যোগাযোগ করার জন্য আমি তার পূর্ণ ঠিকানা চাই। নজরুল সাহেবের ইউনিয়নের নাম, তার গ্রামের নাম-ঠিকানা চাই। তার কাছে যাবার জন্য, দেখা করার জন্য সঠিক লোকেশন জানতে চাই। পত্রে সবকিছু জানবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালাম। তার মোবাইল নম্বরটিও লিখে পাঠাবেন। সেই সাথে আরও কিছু তথ্য আমি আপনার কাছে জানতে চাই। তার শ্বশুর বাড়ি কোথায়? ... ঈশ্বরদীতে একসময় নজরুল সাহেব পাগল নামে একটি নাটক লিখেছিলেন কি না এবং তা পরিচালনা করেছিলেন কি না? নজরুল ইসলাম সাহেবের ডাক নাম লক ছিল কি না? এই প্রশ্নগুলির উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে বুঝবো তিনি আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু। ৫০ বছর ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোন খোঁজ পাচ্ছি না। আপনি আমার পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে অনুগ্রহপূর্বক আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে একটি পত্র লিখবেন।'

হে আলোর ফেরিওয়ালা,
জীবন সায়াহ্নের শেষ পর্যায়ে এসে গেছেন আপনি। এখনও হয়তো পাঠাগার নিয়ে আপনার স্বপ্নের শেষ নাই। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার কোনো উত্তরসূরী পাননি যে পাঠাগারটির হাল ধরে শঙ্কামুক্ত করে আপনার স্মৃতিকে ধরে রাখবে। আজকের এই পাঠাগার সম্মেলনের মহতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনাকে জানাতে চাই–অত্র অঞ্চলে গড়ে ওঠা সকল পাঠাগারকর্মী আজীবন আপনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

আপনি সুস্থ দীর্ঘজীবন লাভ করুন–এই প্রত্যাশা।

(স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন-২০২৩এ অংশগ্রহণকারী সকল পাঠাগার কর্মীর পক্ষে লিখিত ও সম্মেলনে পঠিত)

বক্তব্য রাখছেন লেখক

বাংলাদেশে সমাজকর্ম
সমাজকর্মী হাবিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের (বামে) সঙ্গে কথপোকথনে লেখক

সারা বিশ্বে সমাজকর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মার্চ মাসের ৩য় মঙ্গলবার World Social Work Day 2023 (WSWD2023) পালিত হয়। অত্যন্ত ধুমধামের সাথে র‍্যালি, মানববন্ধন, কনফারেন্স, গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে দিনটি পালিত হলেও বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সীমিত পরিসরে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। ২০১৪-১৫ সাল থেকে CSWPD (Community Social Work Practice & Development) Foundation-এর উদ্যোগে দিনটি পালিত হয়। তাদের আয়োজন কেবল উদযাপনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজকর্ম ও সমাজকর্মের তাৎপর্য সবার কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ও সমাজকর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্যও তারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ২০১৮ সাল থেকে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন শুরু করেন। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাজকর্মী, গবেষক ও অধ্যাপকগণ তাদের গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করে থাকেন ও সমাজকর্মের নানান দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

এই ধারাবাহিকতায় ১১-১৩ মে ২০২৩ CSWPD বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস ২০২৩ উপলক্ষে পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঢাকাস্থ কওই মিলনায়তনে ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনের এবারের মূল প্রতিপাদ্য "Respecting Diversity Through Joint Social Action" অর্থাৎ "যৌথ সমাজকর্মের মাধ্যমে বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো।"

পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়াম্যান ও সাবেক এমপি জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান BAC (Bangladesh Accreditation Council)-এর বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। সম্মেলনের আহ্বায়ক CSWPDএর প্রেসিডেন্ট এবং পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন পর্বে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. আবুল হোসেন এবং মূল বক্তা ছিলেন জাপান ওমন্সে ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস প্রফেসর Dr. Mariko Kimura, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির এপ্লাইড সোশ্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক Professor Dr. Eric CHUI, ভারতীয় সংস্থা নানরিতামের নির্বাহী পরিচালক Ranjana Sengupta প্রমুখ। এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মালয়েশিয়ান সিএসও-এসডিজি এলায়েন্সের সহসভাপতি Professor Dr. Datuk Denison Jayasooria.

সম্মেলনে আমেরিকা, ভারত, জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার ৩৫ জন প্রতিনিধি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনলাইনে আরও ২৪টি দেশের প্রতিনিধিসহ মোট ৩০টি দেশের সমাজকর্ম বিষয়ের অধ্যাপক ও গবেষকগণ যুক্ত হয়ে সম্মেলনটিকে সমৃদ্ধ করেন। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও ২৫ জন অধ্যাপক যুক্ত হন যার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দেশের প্রায় ১১০টি বেসরকারি উন্নয়ন

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে এ বছর সব মিলিয়ে প্রায় ১৩০টি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সম্মেলটি সার্বজনীন রূপ লাভ করে। এবারের সম্মেলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রথমবারের মতো দেশে CSR (Corporate Social Responsibility) Summit বাস্তবায়ন। দেশের প্রসিদ্ধ কিছু কোম্পানির (BSRM, Nestle Bangladesh, BD Group, DBL, Bkash) সিএসআর প্রধানগণ এই সামিটে অংশগ্রহণ করেন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কোম্পানির লাভের একটা অংশ কিভাবে সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন WSWD 2023 সম্পর্কে এর আহবায়ক CSWPD-এর প্রেসিডেন্ট এবং পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের সাথে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য, সফলতা ও দেশে সমাজকর্মের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি যা নিচে তুলে ধরা হলো।

প্র: এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কী?

উ: ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের উপদেষ্টাদের সুপারিশ এবং সহায়তায় ঢাকায় ৩ মাসের স্বল্পমেয়াদী সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হলেও এখন পর্যন্ত সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজকর্মকে একটা জায়গা করে দিতেই আমাদের এই আয়োজন।

প্র: পেশা হিসেবে সমাজকর্মের স্বীকৃতি কেন জরুরি?

উ: যখন আমরা সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে ভাববো, সমাজের মানুষ যদি তা গ্রহণ না করে বা রাষ্ট্র যদি স্বীকৃতি না দেয় তাহলে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে সমাজে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না। আমাদের দেশে এখনো শিক্ষার্থীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট হতে চাইলেও কেউ সমাজকর্মী হতে চায় না। অথচ দেশের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সমাজকর্ম পড়ানো হচ্ছে। সমাজকর্মকে এদেশে ভলান্টারি সার্ভিস হিসেবে দেখা হয়, অন্য কোন পেশার পাশাপাশি মানুষ সমাজের জন্য কাজ করবে এমনটাই ধারণা। সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম যদি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পায় তবে তার প্রতি মানুষের ধারণা বদলে যাবে, মানুষের কাছে সমাজকর্ম বা সমাজকর্মীর গুরুত্ব বাড়বে এবং সমাজকর্ম নিয়ে পড়াশোনা করা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

প্র: আমরা দেখতে পাই বর্তমান সময়ে অনেকেই, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যারা সমাজকর্মের বাইরে অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করছে তারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নানা ধরনের সমাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়। সমাজকর্ম যদি পেশাদার মর্যাদা পায় তখন এই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমাজকর্মের পরিমাণ কমে আসবে কি?

উ: এক কথায় যদি বলতে হয়, আমি মনে করি না সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমাজকর্ম ব্যাহত হবে। দুটো কারণে সাধারণত আমরা সামাজিক কাজ করে থাকি। প্রথমত পারলৌকিক। প্রত্যেক ধর্মেই পরলোকে ভাল কাজের ফল দেয়ার কথা বলা আছে। সেই চিন্তা থেকে আমরা সামাজিক ভাল কাজ করে থাকি। আর দ্বিতীয়ত যে কোন ভাল কাজ মানুষকে দুনিয়াতেও একটা মানসিক শান্তি দিয়ে থাকে। মানসিক শান্তি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা সমাজকর্মের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। সুতরাং বলা যায় পেশা হিসেবে সমাজকর্ম স্বীকৃতি পেলে মানসিক শান্তির পাশাপাশি একটা স্বীকৃতি সে কাজের প্রতি আগ্রহটা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিবে।

প্র: বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?

উ: সমাজকর্ম যদি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চায় তাহলে প্রথমে দরকার একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সমাজকর্ম বিষয়ক যে পরিবর্তনগুলো আসছে সে অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব গবেষণাগ্রন্থ প্রয়োজন। সাধারণত আমরা আমেরিকা, ইংল্যান্ডের লেখকদের যে বইগুলো পড়ছি বা পড়াচ্ছি সেগুলো তাদের দেশের কনটেক্সটে রচিত। সেগুলাকে আমরা আমাদের সমাজের সাথে মিলিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের উচিত বাংলাদেশের অথবা ভারতীয় উপমহাদেশের কনটেক্সটে কেসভিত্তিক তত্ত্ব ডেভেলপ করে তার আলোকে সমাজকর্মকে জানা এবং এ সংক্রান্ত প্রচুর বই দরকার। তাছাড়া আরও যদি বলতে হয়, আমি বলবো আমাদের দেশে সমাজকর্ম চর্চার ক্ষেত্র ওভাবে এখনো তৈরি হয়নি। যেমন আমরা আমাদের সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানে পাঠাই সেখানে তারা যেসকল সুপারভাইজার পায় তাদের বেশিরভাগই অন্য ডিসিপ্লিনের হয়ে থাকে, ফলে সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সিমপ্যাথি, এমপ্যাথি, স্কিল বা নলেজের একটা ঘাটতি থেকে যায় এবং শিক্ষার্থীরাও সঠিক দিকনির্দেশনা পায় না।

প্র: এ সম্মেলন থেকে এ বছর আপনাদের প্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

উ: এ বছর সম্মেলনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বা সফলতা সম্পর্কে বলতে হলে আমি বলবো, IFSW (International Federation of Social Worker)-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট Joachim Cuthbert Mumba জাম্বিয়া থেকে আমাদের এ সম্মেলনে অনলাইনে যুক্ত হয়ে সম্মেলনকে গ্লোবালি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাদার স্বীকৃতি নিয়ে কাজ করার এটা সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম বলে উল্লেখ করেছেন।

সবশেষে সমাজকর্মী জনাব হাবিব একটি কথা বলে তার সাক্ষাৎকারপর্বের সমাপ্তি টানেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই, আমি একজন সমাজকর্মী হিসেবে খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সোনার মানুষ হতে হলে আমাদের প্রত্যেকের অবশ্যই সমাজকর্মীর মানসিকতা থাকতে হবে এবং এটা চর্চায় অনুশীলিত হতে হবে।"

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ

চেতনায় স্বদেশ গণগ্রন্থাগার
একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন

হুমায়ুন কবির

বই কিনে কেউ কোনো দিন দেউলিয়া হয় না। বলেছেন, সৈয়দ মুজতবা আলী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখকষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। আর জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন–বই, বই এবং বই, বলেছেন লিও টলস্টয়। বিখ্যাতজনদের এই উক্তিগুলোই বলে দেয়, একজন মানুষের জীবনে বই পড়া কতোটা জরুরি। আমি মনে করি একটা মানুষের শরীরের বিকাশের জন্য যেমন প্রতিদিন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনই মানসিক বিকাশের জন্য সমান গুরুত্বের সহিত বই পড়া দরকার। লেখালেখির সাথে যারা জড়িত তাদের বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই, লেখকের আঁতুড় ঘর হচ্ছে গ্রন্থাগার। যিনি যতো বড় লেখক তিনি ততো বড় পাঠক। আর এ পাঠ বা অধ্যয়নের জন্য দরকার গ্রন্থাগার। একটা গ্রন্থাগার সভ্য মানুষ গড়ার একটা কারখানা। গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির অগ্রগতির প্রতীক। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহন। অতীতের সাথে বর্তমানের, বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপন করে গ্রন্থাগার। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালন-পালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'।

অনেকের মতে জ্ঞান অর্জনের দুটি উপায় রয়েছে। একটি হলো ভ্রমণ করে আর অপরটি হলো বই পড়ে। ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিত্তশালী হতে হয়। কারণ ভ্রমণ করতে প্রচুর টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়। তাই আমরা জ্ঞান অর্জনের সহজ মাধ্যম হিসাবে বইকে বেছে নিতে পারি। আমাদের এই সমাজে যে হারে সন্ত্রাস, অন্যায়, অবিচার এবং মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূলে রয়েছে গ্রন্থাগার বিমুখতা। বর্তমানে আমাদের যুবসমাজ যেভাবে অপসংস্কৃতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র

অনেকের মতে জ্ঞান অর্জনের দুটি উপায় রয়েছে। একটি হলো ভ্রমণ করে আর অপরটি হলো বই পড়ে। ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিত্তশালী হতে হয়। কারণ ভ্রমণ করতে প্রচুর টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়। তাই আমরা জ্ঞান অর্জনের সহজ মাধ্যম হিসাবে বইকে বেছে নিতে পারি। আমাদের এই সমাজে যে হারে সন্ত্রাস, অন্যায়, অবিচার এবং মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূলে রয়েছে গ্রন্থাগার বিমুখতা। বর্তমানে আমাদের যুবসমাজ যেভাবে অপসংস্কৃতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো যুবসমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা

উপায় হলো যুবসমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইতো। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

আর এই গ্রন্থাগার যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন আলোকিত মানুষ এবং তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটিও নিঃসন্দেহে একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান চেতনায় স্বদেশ গণগ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আমার প্রিয়জন ও প্রিয় মানুষ শ্রদ্ধেয় কবি আমির হোসেন স্যার। তিনি একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকও বটে। যাঁর রয়েছে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম ও সৃজনশীল কাজ। কথাসাহিত্যিক আমির হোসেন একজন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী, গুণি মানুষ। তিনি একাধারে একজন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার, গবেষক, আলোচক ও সংগঠক। এত সব সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরে শিমরাইলকান্দিতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অনেক বাধাবিপত্তিকে মোকাবিলা করে চেতনায় স্বদেশ গণগ্রন্থাগারটিকে দাঁড় করিয়েছেন ।

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। এখানে মহল্লা ও তার আশেপাশের এলাকার জ্ঞানপিপাসু মানুষজন জ্ঞান অর্জনের জন্য যাতায়াত করছেন। এলাকাবাসী অত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎতের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন। গ্রন্থাগারটির রয়েছে মনোরম পরিবেশ। পৌরসভার খুব গুরুত্বপূর্ণ ১১নং ওয়ার্ডে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠলেও পরিবেশগতভাবে গ্রামের মতো ছায়ামাখা স্থানটি শহরের লেখকদের কাছে ইতোমধ্যেই একটি প্রিয় স্থান হয়ে উঠেছে।

বই পড়া ছাড়াও গ্রন্থাগারটির উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়ে থাকে। শ্রদ্ধার সহিত পালন করা হয়ে থাকে কবি, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন গুণীজনের জন্ম-মৃত্যু দিবসও। প্রতিষ্ঠানটির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট-বড় ফলজ, বনজ ও ফুলের গাছ। বিচিত্র রকম ফুলের সুবাস ও পাখপাখালির কূজনে চারপাশ মুখরিত থাকে সকাল বিকেল। প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ এবং ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ পরিষদ। উক্ত দুটি পরিষদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাচ্ছে। আজকের এ প্রতিষ্ঠানটির আরো প্রসার ঘটবে, ফুলে-ফলে মঞ্জুরিত বিকশিত হয়ে তৈরি করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার দেশের জন্য অসংখ্য সোনার মানুষ।

লেখক: কবি ও সংগঠক

শিক্ষা কি কেবলই চাকরিমুখী!

অলোক আচার্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য বহু বছর আগে থেকেই চাকরিমুখী হয়ে গেছে। আমরা খুব ধীরে ধীরে আমাদের কয়েক প্রজন্মকে এটা শিখাতে সক্ষম হয়েছি যে শিক্ষা কেবলই চাকরি-বাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়। বাবা-মা, শিক্ষক, প্রতিবেশী সবাই এটাই বলে, শেখায়। ছেলেবেলায় শিশুকে পড়ালেখা শিখাতে বলা হয়: লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে! অর্থাৎ পড়ালেখা না করলে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়া যায় না! এর অর্থ হলো পড়ালেখা করে বড় চাকরি পেয়ে গাড়িতে চড়া বা এরকম কিছু। সন্তানের কাছে মা-বাবা পড়ালেখা শেষে একটা ভালো চাকরিই আশা করে। তা যদি মোটা অর্থের বিনিময়েও হয় তাতেও সমস্যা নেই। চাকরি তো হবে!

শিক্ষা মানুষের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করার কথা। অথচ বাস্তবে এর প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এ.পি.জে আবদুল কালাম শিক্ষা নিয়ে খুবই চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন, যতদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া হবে, ততদিন সমাজে শুধু চাকর জন্মাবে। যে কথার বাস্তবিক প্রমাণ আজকের সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। একটা সার্টিফিকেট আর চাকরি, তারপর জীবনে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না!

ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব পেয়েছিলেন লর্ড মেকলে সাহেব। বলা হয়, লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সংসদে তার বক্তব্যে বলেছিলেন, আমি ভারতের আনাচে কানাচে ঘুরেও একজন ভিক্ষুক কিংবা একজন চোরের দেখা পাইনি। এদেশে এতটা ধনসম্পদ, এদেশের মানুষের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের এতটা উচ্চস্তর দেখেছি যে, এদেশবাসীর শিক্ষা, তাদের ধর্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুরোপুরি ভেঙে দিতে না পারলে আমরা কোনদিনই দেশটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো না।"

মেকলে প্রস্তাব করেছিলেন, "আমরা এসব ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থা আর সংস্কৃতিকে এমনভাবে বদলে দেব যেন তারা যা কিছু বিদেশি, যা কিছু ইংলিশ, সেসব কিছুকেই তাদের নিজেদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাবতে শিখবে।" ইংরেজ সাহেবদের সেই ইচ্ছার প্রতিফলন আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখতে পাই। আমাদের পোশাকে ও চালচলনে আমরা সর্বদাই সেই সাহেবদের অনুসরণ করার চেষ্টা করি। আমাদের শিক্ষা এখন ভালো চাকরি দিতে পারে, কিন্তু ভালো মানুষ তৈরি করাটা যেন শিক্ষার কোনো উদ্দেশ্য নয়। সকলেই চাকরি চাইছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশই চাইছে বিসিএস ক্যাডার হতে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকেই আজ বিসিএস পাস করে ক্যাডার হতে চায়। হতে না চাওয়ারও কোনো কারণ নেই।

কিন্তু শিক্ষার এভাবে বিসিএসমুখী হওয়ার ভালোমন্দ দিকটাও আমাদের ভাবা দরকার। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে যত না দরকার কর্মকর্তাদের, তার চেয়েও বেশি দরকার গবেষক, বিজ্ঞানী বা এমন মানুষ যিনি দেশের অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তাদের প্রথম থেকেই স্বপ্ন দেখানো হয় ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হয়ে কিভাবে লেখাপড়া করলে বিসিএস পাস করা যায়! তাদেরকে স্বপ্ন দেখানো হয় না যে কিভাবে একজন মানুষ হাজার হাজার মানুষকে চাকরি দিতে পারে, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পণ্যকে ছড়িয়ে দিতে পারে অথবা সৃষ্টিশীল কোনো কাজ করতে পারে যা দেশকে সম্মান এনে দিতে সক্ষম। চীন ও ভারতের অনেক পণ্য আজ ইউরোপ-আমেরিকার পণ্যকে টেক্কা দিচ্ছে। আমাদের কতজন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করে গবেষণায় ব্রতী হয়েছে তা ভাবার বিষয়। যদিও গবেষণার জন্য অনেকে বাইরের দেশে চলে যান ও কেউ কেউ সেখানেই থেকে যান। মাত্র কিছুদিন আগে করোনা অতিমারি আমাদের একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে। করোনার একটা প্রতিষেধকের জন্য আমরা কিন্তু প্রাণপণে নির্ভর করেছি বিজ্ঞানিদের ওপর। কবে একজন এর কার্যকর টিকা বের করতে পারবেন তার অপেক্ষা করেছি। একজন মানুষ পুরো পৃথিবীকে স্বপ্ন দেখাতে পারে।

আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মেধাকে কুক্ষিগত করে একটি দিকে নিয়ে গেছি–চাকরি করতে হবে, নইলে পড়ালেখা বৃথা। আজও চাকরি না পেলে একজন মানুষ এদেশে অবহেলিত হয়। ব্যবসা করলে, কৃষক হলে, অথবা খামার করে সফল হলেও চাকরি না করার খোঁটা শুনতে হয়। প্রতিদিন সকালে সুটেড-বুটেড হয়ে অফিসের গাড়িতে চড়ে এসি রুমে ঢুকে চাকরি করাই বেশিরভাগের স্বপ্ন। বাকিটা দুঃস্বপ্ন। চাকরির বাজারেও নানা কারসাজি হয়।

যে শিক্ষা মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে না তার কোন প্রয়োজন নেই। আজকাল যেন মূল লক্ষ্য কেবল সার্টিফিকেট। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা করলেও আবিষ্কারক হওয়ার কথা কিন্তু তেমন একটা কেউ বলে না। কারণ ওতে শুধুই ধৈর্য লাগে, পয়সা আসে না। আমাদের এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা কেবল বিসিএসমুখী বা চাকরিমুখী শিক্ষা চাই না। শিক্ষা তার প্রকৃত কাজটি করে প্রকৃত চেতনার উন্মেষ ঘটাক-এটাই প্রার্থনা।

অলোক আচার্য: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

সিদীপের বার্ষিক প্রোগ্রাম মিটিং-২০২৩

কুষ্টিয়ার 'দিশা টার্কে' গত ২৯ থেকে ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে সিদীপের বার্ষিক প্রোগ্রাম মিটিং। সিদীপের সকল ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণ, সকল বিভাগ প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এতে অংশ নেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'দিশা'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রবিউল ইসলাম এবং সহ-নির্বাহী পরিচালক ও সিদীপের পরিচালনা পর্ষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য জনাব নাজমুস সালেহিন নয়ন প্রথম দিনের নৈশভোজে শরিক হয়ে সিদীপের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এই মিটিংয়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিদীপ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, সদস্য অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী, সদস্য জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না এবং সদস্য জনাব ফাহমিদা করিম। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন "সফলতা আমাদের অনেক আছে। তার পাশাপাশি কিছু ব্যর্থতা রয়েছে। ব্যর্থতাকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে প্রতিটি ব্যর্থতাকে আগামীতে সফলতায় রূপ দিতে হবে। আমরা যদি বিগত বছরের ভুলত্রুটি শুদ্ধ করে চলতি বছর শুরু করি তাহলে এ অর্থবছরটি আমাদের জন্য বয়ে আনতে পারে আনন্দবার্তা।" এ প্রোগ্রাম মিটিংয়ে বিগত অর্থবছরের সফলতাগুলো যেমন তুলে ধরা হয়। তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ভালো করার সুযোগ ছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে স্লাইড প্রোজেকশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধাপগুলো তুলে ধরে এগিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আগামী অর্থবছরের বৈশ্বিক অর্থনীতি ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেরা জোন, সেরা এরিয়া এবং সেরা শাখা গুলোর কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সনদ প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ব্রাঞ্চ হিসাবে ওয়ারুক ব্রাঞ্চ, এরিয়া হিসাবে হাজীগঞ্জ এরিয়া এবং জোন হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জোন সেরার স্বীকৃতি লাভ করে। জনাব ইব্রাহিম মিঞা (জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড হেড অব এইচআর অ্যান্ড ওডি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) 'পিপলস ফার্স্ট'সহ সিদীপের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ উপস্থাপন করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। পরিচালক-প্রোগ্রাম জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স জনাব সজীবুর রহমান মিটিংটি সঞ্চালন করেন। এই মিটিংয়ে বিভাগ প্রধানগণ এবং পরিচালক ফিন্যান্স অ্যান্ড ডিজিটাইজেশন জনাব এস. এ. আহাদ তাদের মূল্যবান ফিডব্যাকসহ মতামত প্রদান করেন।

সবশেষে সিদীপ পরিচালনা পর্ষদের মান্যবর চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি কিছু পরামর্শ প্রদান করে তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে মিটিংটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

সিদীপ ৫ আগস্ট ২০২৩এ যথাযোগ্য মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। এদিন সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠপর্যায়ের সব শাখায় দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। সিদীপের ওয়েবসাইটেও ল্যান্ডিং ব্যানার হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। এ উপলক্ষে ৩ আগস্ট সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল এবং তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী এতে অংশ নেন। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা জুমে অংশ নেন। এ সভায় শেখ কামালকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সিদীপ পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। ৫ আগস্ট সিদীপের একটি প্রতিনিধি দল ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ সময় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: ফসিউল্লাহ্ এবং কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সিদীপ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগ দেন। সিদীপের মাঠ পর্যায়ের সকল শাখায় এ উপলক্ষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ের সিদীপ কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন নির্দেশিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা ও স্মৃতিচারণ সভায় অংশ নেন। এছাড়াও এ উপলক্ষে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে এক টেবিল-টেনিস টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

২২ আগস্ট ২০২৩ ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। সিদীপ পরিবারের সকল সদস্য বিনম্র শ্রদ্ধায় নানা আয়োজনের মাধ্যমে এদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন। এদিন পবিত্র কোরআন খতমের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর কবর জিয়ারত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ এতে অংশ নেন। এরপর দুস্থদের মাঝে খাবার এবং মশারি বিতরণ করা হয়।

বিকেল সাড়ে তিনটায় সিদীপ ভবনের সভাকক্ষে তাঁর স্মৃতিচারণ, তাঁকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে তার কবিতা আবৃত্তি এবং তাঁর স্মৃতিচারণ করা হয়। সিদীপের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তাঁর বড়ভাই জনাব ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য ড. নার্গিস ইসলাম। এরপর তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের স্থায়ী/অস্থায়ী (নিয়মিত) সহকর্মীগণ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের জন্য কমপক্ষে একটি করে বই দান করেন। সিদীপের প্রতিটি শাখায় তাঁর স্মৃতিচারণ, মাগফিরাত কামনায় দোয়ার আয়োজন এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং সকল সহকর্মী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের জন্য বই দান করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর ঢাকার আশুলিয়ায় সিদীপের কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন

১৪ জুন ২০২৩এ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ঢাকার আশুলিয়ায় সিদীপের কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্সূচির শিশুদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এই সফরকালে পিকেএসএফ-এর দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তার সঙ্গে ছিলেন। সকালে তিনি সিদীপের আশুলিয়া শাখার কর্ম-এলাকায় বেলমা গ্রামের বেলমা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার সমিতি সদস্যদের নানামুখী কর্মতৎপরতার খোঁজখবর নেন। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সঙ্গে থেকে তাকে সমিতি এবং প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেন। সমিতি থেকে ড. নমিতা হালদার গ্রিন অ্যাগ্রো ফিশারিজ দেখতে যান। সেখান থেকে যান বায়োফ্লক প্রকল্প দেখতে। এরপর তিনি সিদীপের আশুলিয়া শাখায় গিয়ে পৌঁছলে সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রের দশজন শিশু তাদের নিজেদের আঁকা ছবি উপহার দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়। শাখায় গিয়ে তিনি সিদীপের ভ্যালু চেইন প্রোজেক্ট দেখেন এবং এ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এরপর তিনি শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং মুগ্ধ হয়ে নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। পরে তিনি শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে তিনি দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং সিদীপের এই উদ্ভাবনীমূলক সৃজনশীল উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাবেক শিসক শিক্ষার্থীদের সাফল্য

২০০৫ সালে সংস্থার সলিমগঞ্জ শাখায় মাত্র ৫টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি শুরু করে বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় ২৭৯০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫৭,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা দিয়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে কাজ করছে। যেহেতু শিক্ষাকেন্দ্রে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয় ফলে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে আর শিক্ষাকেন্দ্রে আসে না। তবে শিক্ষার্থীদের বেশিভাগেরই বাড়ি শিক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে হওয়ায় কেন্দ্রের শিক্ষিকার সাথে তাদের যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। দীর্ঘদিন এসব শিক্ষার্থীদের অফিসিয়ালি কোন খোঁজ খবর না নেয়া হলেও সম্প্রতি সিদীপের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরামর্শক্রমে শিসকের আওতাধীন সব শাখা থেকে ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন শিসক শিক্ষার্থীদের ফলের তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছিল। শাখাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, এর আগে যখন সব শাখা থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন শিসক শিক্ষার্থীদের তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছিল তখন ২৩টি শাখা থেকে ২৬৫ জন প্রাক্তন শিসক শিক্ষার্থীর অংশ নেয়ার তথ্য পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু এবার ফলের তথ্য পাঠাতে বলা হলে ২৬টি শাখা থেকে ৩০৪ জনের অংশ নেয়ার তথ্য পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ, এবার নতুন আরও তিনটি শাখা থেকে তথ্য পাঠানো হয়েছে। ১০ আগস্ট পর্যন্ত শাখাগুলো থেকে পাঠানো তথ্য অনুযায়ী: মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ৩০৪ জন, তাদের মধ্যে পাস করেছে ২৬৩ জন, ফেল করেছে ৪১ জন। পাশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৩ জন, জিপিএ ৪.০০-৪.৯৯ এর মধ্যে পেয়েছে ১১৩ জন, জিপিএ ৩.০০-৩.৯৯ এর মধ্যে পেয়েছে ১১৭ জন এবং বাকি ২০ জন জিপিএ ৩.০০ এর নীচে পেয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত ডা.এ.কে. এম আব্দুল কাইয়ুমের বিদায় সংবর্ধনা

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান সিদীপের একটি ঐতিহ্য। তারই ধারাবাহিকতায় ২১ আগস্ট ২০২৩ সকালে প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসা-কর্মকর্তা ডা.এ.কে.এম আব্দুল কাইয়ুমকে এক বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির ডিজিএম (হেল্‌থ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে কয়েকজন কর্মকর্তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার কর্মজীবনের অবদান স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা এবং শীর্ষ কর্মকর্তাগণ তার হাতে পুষ্পস্তবক ও ক্রেস্ট তুলে দেন। নির্বাহী পরিচালক তার বক্তব্যে সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে তার সনিষ্ঠ দায়িত্ব পালন এবং ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত স্বাস্থ্যসেবার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ডা.এ.কে.এম আব্দুল কাইয়ুম তার বিদায়ী বক্তব্যে সিদীপ এবং সিদীপে তার এতদিনের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সামাজিক অভিশাপ যৌতুক

মায়িশা ফাহমিদা সুজানা

যেসকল প্রথা সমাজকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে ও বিবেকবান মানুষের বিবেককে দংশন করেছে তার মধ্যে যৌতুক প্রথা অন্যতম। যৌতুকের বলি হিসেবে বহু অসহায় নারী অকাতরে ও অসময়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে। অভিভাবকগণ সামাজিক-পারিবারিক লজ্জা গোপন রাখতে গিয়ে নিজেরাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। এই যৌতুক সমাজ জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। বৃদ্ধি করেছে সামাজিক সমস্যা, নিয়ে আসছে মানবজীবনে বিপুল দু:খ-দুর্দশা।

যোগ্য-অযোগ্য সব ধরনের পাত্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেবার প্রতিজ্ঞা করা ও রাখার সামাজিক চল বিয়ের ব্যাপার স্বচ্ছন্দ করে বলে তা যৌতুক নামে পরিচিত হয়েছে। পৈতৃক সম্পদ, বেতনের অঙ্ক, গাড়ি-বাড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তির সামাজিক মূল্য যৌতুক প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখে। হিন্দু সমাজে উত্তরাধিকারী আইনে মেয়েরা পিতৃসম্পদের দাবিদার নয় বলে যা নেওয়ার তা বিয়ের সময়েই লাভ করার সুযোগ থাকে, যৌতুক সেখানে এভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর মুসলমান সমাজে মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেও উপরি পাওনার মত যৌতুক সেখানে স্থান করে নিয়েছে।

মেয়ের বিয়ের সময় অভিভাবকরা বরকে যে অর্থ, অলঙ্কার, আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রদান করে তাই যৌতুক। এ যৌতুক কখনো সুযোগ্য পাত্রে কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য পাত্রপক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে অথবা কখনো কন্যাপক্ষের আগ্রহের অতিশায্যে লেনদেন হয়। এই যৌতুক বিভিন্ন নামে রূপ নেয়। কখনো বলা হয়, পাত্রকে সম্মানি বাবদ বা ফার্নিচার বাবদ বা পাত্রকে ব্যবসা করার জন্যে এত লাখ টাকা দেয়া হল। এরকম যত উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় দাবির প্রেক্ষিতে বা পাত্রীপক্ষের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এবং তা যেই নামেই আখ্যায়িত হোক না কেন, তা যৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়ের সুখের জন্য পিতামাতার কল্যাণ কামনা যৌতুকের রূপ ধারণ করে বরের বাড়িতে উপস্থিত হয়। অনেক বাবা-মা মনে করেন, যৌতুকের অঙ্ক যত বড় হবে কন্যার সমাদরও তত বেশি হবে। এমন একটা প্রত্যাশা পিতামাতাকেও উদ্দীপ্ত করে। আবার কখনো অযোগ্য মেয়েকে সুযোগ্য পাত্রের কাছে হস্তান্তরের লক্ষ্যে যৌতুকের পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া তাদের ধারণা, কন্যার অযোগ্যতার অবলুপ্তির জন্য যৌতুক শূন্যস্থান পূরণে সহায়তা করে।

যৌতুক একটা মরণ ফাঁদ। এটা এইডসের মত ভয়াবহ। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে তা ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বর/বরপক্ষ যৌতুককে তার নিজের ন্যায্য পাওনা বলে মনে করে। এতে তিল পরিমাণ কম হলেও তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। আর তার সর্বনাশা পরিণতি বহন করতে হয় নিরপরাধ বউটিকেই। বউকে নিদারুণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। পাত্রপক্ষ মনে করে কন্যাপক্ষ তাদের ঠকিয়েছে। তারপর প্রতিশোধপরায়ণ বরপক্ষের অত্যাচারে অনেক মেয়েকেই অকালে জীবন দিতে হয়, আর ঘর ভাঙ্গা তো অতি সাধারণ ব্যাপার। নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া বউয়ের আর কোন উপায় নেই। মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বউটির বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা থাকে না। যৌতুকের প্রতিশ্রুতি আদৌ বা আংশিক পূরণ করা হয়নি, তাই অত্যাচারের বিচিত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে বর্বর মানসিকতার পরিচয় দেয় বরপক্ষ। কিভাবে কন্যাটিকে বিতাড়িত করা যায়, প্রয়োজনবোধে পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করে যৌতুকলোভী মনের ক্ষোভ মিটানো হয়। প্রতিদিনের পত্রপত্রিকা এর আংশিক সাক্ষ্য। যৌতুকের দাবি মিটাতে না পারলে বরপক্ষ অনেককে হত্যা করে দোষ গোপন রাখার লক্ষ্যে মুখে বিষ ঢেলে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠায়। যৌতুকের সর্বনাশা রূপ নারীর মর্যাদাকে নষ্ট করে, ধ্বংস করে মানবিক মুল্যবোধ। আর মর্যাদা হারিয়ে কন্যা ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুতে পরিণত হয়, সেখানে কন্যাপক্ষ অসহায়-নতজানু মাত্র। পারিবারিক লজ্জা গোপন করার জন্য যৌতুকের কারণে কত নারীর অকালে জীবন বিসর্জন বা আত্মদান লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যাচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অনেক মৃত্যুই খবর হয়ে আসে না বলে যৌতুকের বলির যথার্থ কোন হিসাব নেই।

সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন যৌতুক প্রথার উৎপত্তির উৎস। নারী জাতি মায়ের জাতি। এ জাতিকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে পদে পদে। সামাজিক অনুষ্ঠান, চাকরি ইত্যাদিতে এখনো নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। অর্থবৃত্তি ও শোষণবৃত্তিই এর একমাত্র কারণ। নরনারীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে কেন যৌতুকের দাবি উঠে তা কলুষিত করে? সেদিক বিবেচনা করলে নারীকে বস্তুর মত বিচার, পরশ্রমজীবিতা, শোষণবৃত্তি প্রভৃতিকেই দায়ী বলা যায়। কন্যাকালে পিতার, যৌবনে পতির, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনরূপে গণ্য হয় সে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, নারীর সম্মান-অসম্মানের মূল্য নির্ভর করে পুরুষের ধারণার উপর। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি কোন মূল্য দেয়া হয় না। নারীকে ইচ্ছা ও অনুভূতির মানবিক স্বাতন্ত্র্যে মূল্যায়িত না করে জড়বস্তুর মত ভাবা হয়। তাই এই অবমূল্যয়নের সঙ্গে যৌতুকের অর্থ সমন্বয় করে নারীর স্থান নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যৌতুক প্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে পণ্যের মত বেচাকেনা করা হয়। এখনকার দিনে নারীর মূল্যবোধ ঝুলে আছে নীতিবর্জিত টাকার আংটায়। আজকাল নিজের

যৌতুকের প্রতিশ্রুতি আদৌ বা আংশিক পূরণ করা হয়নি, তাই অত্যাচারের বিচিত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে বর্বর মানসিকতার পরিচয় দেয় বরপক্ষ। কিভাবে কন্যাটিকে বিতাড়িত করা যায়, প্রয়োজনবোধে পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করে যৌতুকলোভী মনের ক্ষোভ মিটানো হয়। প্রতিদিনের পত্রপত্রিকা এর আংশিক সাক্ষ্য। যৌতুকের দাবি মিটাতে না পারলে বরপক্ষ অনেককে হত্যা করে দোষ গোপন রাখার লক্ষ্যে মুখে বিষ ঢেলে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠায়। যৌতুকের সর্বনাশা রূপ নারীর মর্যাদাকে নষ্ট করে, ধ্বংস করে মানবিক মুল্যবোধ। আর মর্যাদা হারিয়ে কন্যা ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুতে পরিণত হয়, সেখানে কন্যাপক্ষ অসহায়-নতজানু মাত্র। পারিবারিক লজ্জা গোপন করার জন্য যৌতুকের কারণে কত নারীর অকালে জীবন বিসর্জন বা আত্মদান লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যাচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অনেক মৃত্যুই খবর হয়ে আসে না বলে যৌতুকের বলির যথার্থ কোন হিসাব নেই

অযোগ্যতা বা শ্রমবিমুখতা সংশোধনের প্রবণতা নেই। সমাজের অন্যের শ্রমার্জিত ভাণ্ডার থেকে যথেষ্ট লুণ্ঠন করে নিজের শুন্যভাণ্ডার পূরণের মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে যৌতুক প্রথা। শোষণ নীতি থেকে যৌতুকের দাবি এসেছে। শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর নারীর মূল্য নির্ধারণ হয় যৌতুকের মাধ্যমে। যোগ্যতা যেমন পাত্রকে উচ্চমূল্যের আসনে বসায়, তেমনি অর্থবিত্ত-সমৃদ্ধ পিতার অযোগ্য কন্যাকে সুযোগ্য পাত্রের হাতে অর্পণ করতে যৌতুককে উৎসাহিত করে। সম্পদসমৃদ্ধ শ্বশুর যেমন জামাইকে ক্রয় করতে চান, তেমনি অর্থ প্রাপ্তির আশায় বা সম্ভাবনায় বরও উদ্দীপ্ত হয়। ফলে যৌতুক প্রথাকে নির্মূল করার ইচ্ছা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয় না।

বর্তমানে যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইন সর্বত্র প্রয়োগ হচ্ছে না। এখানে বরপক্ষ ও কনের পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে লেনদেন করে বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় যৌতুকের খেলা চলে। এমন পরিস্থিতিতে নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, চাকরি দিতে হবে। শিক্ষিত চাকরিজীবী একজন নারী চাকরি করে সারা জীবন অর্থ উপার্জন করবে, পরিবারের সহযোগী হবে। আর এগুলো পুরুষকে মানতে হবে ও বুঝতে হবে। মেয়েদের জীবিকানির্ভর আর্থিক স্বাধীনতার শিক্ষা দিতে হবে। যৌতুক প্রথা নিবারণের জন্য তাই সবদিক থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগ, নারীর শিক্ষা ও মর্যাদা দান, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ–এ সবকিছুই কার্যকর করতে হবে। এর পাশাপাশি যৌতুকলোভী ও দাবিদার পক্ষকে সামাজিকভাবে বয়কট এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে যৌতুক নিবারণের পথ সুগম হবে।

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে, সমাজের ঘৃণাও আছে। তবু দুষ্ট ক্ষতের মত যৌতুক প্রথা সমাজ জীবনে নিরাময় অযোগ্য হয়ে আছে। যৌতুকের জন্য কত নিরপরাধ নারীর জীবন যে বিসর্জন দিতে হচ্ছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তাই নারী সমাজের উন্নতির জন্য সারাবিশ্বে জনসচেতনতা বেড়েছে। পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ, বিশ্ব নারী সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। নারীশিক্ষার সুযোগ বাড়ছে-বাংলাদেশে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। সমাজকে যৌতুকমুক্ত করতে নারীকে জীবনমুখী শিক্ষা প্রদান করে অফিসে-আদালতে তাদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্রেও স্বার্থপর পুরুষের লোভ এখনও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, এভাবে;

করেছি পণ, নেব না পণ,
বৌ যদি হয় সুন্দরি;
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।

এরকম স্বার্থপর পুরুষের লোভ এবং অসুস্থ মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তাই আর্থিক সুস্থতা, জীবনমুখী শিক্ষা আর মানসিক প্রসারতা এখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি দরকার নারী জাগরণ। কেননা, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করাই হবে নারী মুক্তির একমাত্র পথ ও অবলম্বন।

লেখক: বিবিএ প্রফেশনাল ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ , ঢাকা

রাবেয়া বেগম ও আমজেদ হোসেনের ঘুরে দাঁড়ানো

সঞ্জীব মন্ডল

নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় মাধবপুর গ্রামের একজন কৃষাণী মোসা: রাবেয়া বেগম, স্বামী মো: আমজেদ হোসেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ০২ জন ও ০৩ মেয়ে। দুই মেয়ের লেখাপাড়া ও তার পরিবারের খরচ চালানো অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। তার নিজের ১২০ শতক জমি যেটা দুজনেই কঠোর পরিশ্রমে বহুমুখী শাক-সবজি চাষ করেন। প্রতিনিয়তই তিনি কৃষি কাজের খরচের জন্য অর্থের সমস্যায় পরেন। এমন সময় তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে রাবেয়া বেগম সিদীপ সংস্থার সদস্য হন।

প্রথম ধাপে তিনি চিচিঙ্গা চাষের জন্য ২০,০০০/- টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণ করে তিনি ১০শতাংশ জমিতে হাইব্রিড চিচিঙ্গা আশা জাতের চিচিঙ্গা এবং সাথি ফসল হিসেবে ডাঁটাশাক ও লালশাকের চাষ করেন। ১০ শতক জমি থেকে তিনি ২,০০০ কেজি চিচিঙ্গা বাজারে বিক্রয় করেন। চিচিঙ্গা বিক্রয় করে তিনি মোট (২,০০০x৩৫=৭০,০০০/-) সত্তর হাজার টাকা পান। সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি (৭০,০০০-২০,০০০=৫০০০০/-) পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করেন। পাশাপাশি সাথি ফসল ডাঁটাশাক ও লালশাক বিক্রয় করে ২৫,০০০/- টাকা আয় করেন।

পুনরায় দ্বিতীয় ধাপে তিনি টমেটো চাষের জন্য ৩০,০০০/- টাকা কৃষি ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষিঋণ গ্রহণ করে তিনি ১২ শতাংশ জায়গায় বারি টমেটো-৫ জাতের টমেটোর চাষ করেন। ১২ শতক জমিতে তিনি ২,৫০০ কেজি টমেটো (২,৫০০x৫০= ১,২৫,০০০/-) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ফলে সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি (১,২৫,০০০-৩০,০০০=৯৫,০০০/-) পঁচানব্বই হাজার টাকা আয় করেন।

তৃতীয়ধাপে তিনি শসা চাষের জন্য ২০,০০০/- টাকা কৃষিঋণ নেন। ঋণ গ্রহণ করে তিনি ১২ শতাংশ জায়গায় হাইব্রিড শসা (ময়নামতি জাতের) এবং সাথি ফসল হিসেবে ধনিয়া পাতার চাষ করেন। ১২ শতক জমিতে তিনি ২,৫০০ কেজি শসা বাজারে বিক্রয় করেন। বিক্রয় করে (২,৬০০x৩৫= ৯১০০০/-) একানব্বই হাজার টাকায়। সকল খরচ বাদ দিয়ে তিনি (৯১,০০০-২৫,০০০) = ৬৬০০০/- টাকা আয় করেন। পাশাপাশি ধনিয়াপাতা বিক্রয় করেও তিনি ৩০,০০০/- টাকা আয় করেন।

এছাড়া তিনি ৮ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেন এবং প্রায় (১,৫০০x৩৫= ৫২,৫০০/-) বায়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকার বেগুন বিক্রয় করেন। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তিনি নীট আয় করেন (৫২৫০০-১২০০০=৪০৫০০/) চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা এবং ৮ শতক জমিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ করে প্রায় ৫০০ পিস মিষ্টি কুমড়া (৫০০x৮০=৪০০০০/-) চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। পাশাপাশি মিষ্টিকুমড়া শাক বিক্রয় করেন আরও ১৫০০০/-টাকার। মিষ্টিকুমড়া ও মিষ্টিকুমড়া শাক থেকে তার মোট আয় হয় (৪০,০০০+১৫০০০=৫৫,০০০) পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

বহুমুখী সবজি চাষ করার মাধ্যমে তার পরিবারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। পাশাপাশি তিনি আরও ২০ শতক চাষের জমি ক্রয় করেছেন। মো: আমজেদ হোসেন জানান যে, তার সবজি ক্ষেতের কোন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন হলে উক্ত ব্লকের ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষিকর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। এছাড়া তাকে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী ও ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, কৃষিকল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বীজ, সার দিয়ে সিদীপ তাকে সহোযোগিতা করেন। বর্তমানে তাকে দেখে আশেপাশের এলাকার আরও অনেক কৃষক বহুমুখী সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।

লেখক: সিদীপের ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), চাটখিল ব্রাঞ্চ, নোয়াখালী

রুবিনা খাতুনের নতুন সার প্রকল্প

মো. ইসরাফিল হোসেন

নাম- মোছা: রুবিনা খাতুন, স্বামী-মো: জাকির হোসেন, গ্রাম-পাজুলিয়া, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। তিনি মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, চালকুমড়া, লাউ, পেঁপে, ইত্যাদির পাশাপাশি নিজ বাড়িতে কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন। রুবিনা খাতুনের পরিবার অনেক বছর ধরে কৃষিকাজ ও কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের সাথে জড়িত। রুবিনা খাতুন বলেন তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার নিজের জমিতে ব্যবহার করেন এবং খুব কমদামে অল্পকিছু সার বিক্রয় করতে পারেন। যার কারনে তারা নিজেদের চাহিদা যতটুকু ঠিক ততোটুকুই কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন। রুবিনা খাতুন লোকমুখে জানতে পারেন যে সিদীপ গাজীপুর সদর ব্রাঞ্চ থেকে স্বল্প লাভে সাধারণ এবং এককালীন ঋণ দিয়ে থাকে। তিনি ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন এবং সিদীপের সদস্য হয়ে এককালীন এস.এম.এ.পি ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণের সময় তাকে সিদীপের পক্ষ থেকে ট্রেনিং প্রদান করা হয়। তিনি ট্রেনিং গ্রহণের সময় জানতে পারেন এক জমিতে কিভাবে অল্পসময়ে ২-৩ ফসল উৎপাদন করা যায় এবং সিদীপ কিভাবে কৃষিজাত পণ্য

বাজারজাতকরণে সহায়তা করে থাকে। একথা শুনে রুবিনা খাতুন আরও খুশি হন এবং সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বাজারজাতকরণে সহায়তা করার জন্য বলেন। এরপর রুবিনা খাতুন কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেন এবং সিদীপ ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন যাতে তার উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয়ের জন্য তাকে বিভিন্ন কীটনাশকের দোকান ও পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয়কেন্দ্রে নেয়ার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়াও পাইকার যেন তার নিজ বাসা থেকে একবারে তার সকল কেঁচো কম্পোস্ট সার ক্রয় করে নিয়ে যায় এবং তার অনেক লাভ হয় সে ব্যাপারে সহযোগিতা চান। রুবিনা খাতুনের কথা শোনার পর সিদীপ থেকে তাকে গাজীপুর চৌরাস্তা, সাভার, আশুলিয়া, মাওনা ও শ্রীপুরের বিভিন্ন কীটনাশক দোকানের সাথে তার উৎপাদিত সার বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় এবং রুবিনা খাতুন গাজীপুর চৌরাস্তা, সাভার, আশুলিয়া, মাওনা, শ্রীপুরে বিভিন্ন কীটনাশক দোকানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার সকল উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয় করেন। একসাথে সব কেঁচো কম্পোস্ট সার বিক্রয় করতে পারায় তিনি আর্থিকভাবে খুব লাভবান হন।

কেঁচো কম্পোস্ট সার

লেখক: সিদীপের ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), বোর্ডবাজার ব্রাঞ্চ, গাজীপুর

বিজয়ের পূর্বেকার পরাজয় উদযাপন

আলমগীর খান

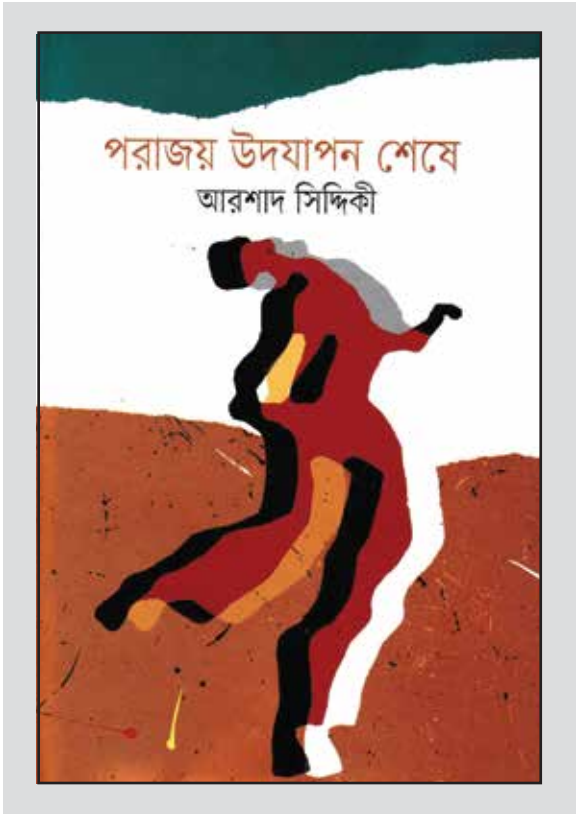

কবি আরশাদ সিদ্দিকীর কাব্য 'পরাজয় উদযাপন শেষে' জীবনের পেয়ালা থেকে অবলীলায় হেমলক পানের বয়ান আর তারপর সক্রাতাসের মত নির্ভিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জীবন উদযাপনের আয়োজন। শৈশব থেকে কবির স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে আজ অবধি, তবু স্বপ্ন দেখার রোগে আক্রান্ত কবি দেখেই চলছেন মানুষের মুক্তির স্বপ্ন–খোঁজ করছেন মানুষের মুক্তির খবরের। মোস্তাফিজ কারিগরের সুন্দর প্রচ্ছদে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বইটি প্রকাশ করেছে সৌম্য প্রকাশনী।

জীবনের ভ্রমণ তাঁকে কেবল ক্লান্ত করেনি, করেছে ক্রুদ্ধও। ক্ষোভ, অভিমান ও বেদনার বাষ্পের ভিতর তাই উত্থিত হয়েছে ক্রোধের নীলশিখা। কবি তাই বলছেন: "বাইসন! জেগে ওঠো। পৃথিবীর বড্ড বেশি প্রয়োজন তোমাকে এখন। তোমার মায়াময় চোখে আনো ক্রুর হিংস্রতা। আক্রোশে বিদীর্ণ করো সব।" (বাইসন)

তবে কবির ক্রোধ কেবল আগুনের শিখা হয়ে পোড়ায় না, সমাহিত করে বিশ্লেষণী ভাবনায়–পানির তোড়ের মত জমতে থাকে কিছু বাঁধের কিনারে এভাবে:

এটা গুম নয়, গুলি করে হত্যা নয়
মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন
দেশটা আজ লালমনিরহাট
দাউ দাউ জ্বলছে আগুন
... ...
মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন
মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন
(মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন)

শৈশবে দেশভাগের যন্ত্রণার শিকার কবি জানেন না কেন, শুধু আবছা মনে পড়ে:

হয়তো সাধারণ, না হয় ঝলমলে ছিলো স্বপ্নগুলো
অন্য আরেক সীমারেখা পার হতে ছুটছিলো
অবিরাম ছুটছিলো তারা
(পরিত্রাণ)

সেই থেকে কবি দেখেছেন কীভাবে তার প্রজন্ম ও সময় অধোগতির শিকার হয়। প্রগতিশীলতার নামে জানা-অজানা কতধরনের পশ্চাৎপদতা ঘটেছে। কারা বীভাবে বিজয়ী হয়, সেইসব। অথচ মধ্যবিত্তের বোরডম আর এঙ্কজাইটির জগতেই ঘুরপাক খেতে থাকেন তিনি। তার কাছে "মুণ্ডুটা উজিয়ে হাঁটাচলা মানে বিড়ম্বনা।" তাই প্রার্থনা করে বলেন:

কি এমন ক্ষতি হতো
মাথাটা যদি একটু নিচু হতো
হে পরম-প্রকৃতি
আমাকে একটু খাটো করে দাও
(বামনত্ব)

আরশাদ সিদ্দিকীর কবিতায় এক পেলব গতিময়তা আছে যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় আপন শক্তিতে। কবিতার প্রচ্ছন্ন সুর ও সহজ ছন্দোময় চলমানতা তাকে আকৃষ্ট করে। ফলে একরকমের ভাললাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয় সে। এখানেই কবির প্রকৃত শক্তি। ঠিক এইরকম: কেবল আজব্দি আমি তোমার খোলা চুলের জটিল ধাঁধা, না মেলা সরল অঙ্কে বেসামাল হয়ে রইলাম। (অলকদাম)

তবে কবির এই শক্তি শূন্য থেকে উৎপন্ন নয়। এর শিকড় নিহিত তাঁর সমাজমনস্কতায়, পরিবর্তনের প্রেরণায় ও সূক্ষ্ম অনুভবে। কবি দেখেছেন বহু স্বপ্নের খুন। তাঁর "স্বপ্ন ছিল লাল নিশানের/ স্বপ্ন ছিল সবুজ ডাঙার/ স্বপ্ন ছিল শেকল ভাঙ্গার/ স্বপ্ন ছিল ঋণ চুকাবার।" যদিও তিনি বলছেন, "স্বপ্নের মৃত্যু এমন কিছু নয়।" (জয়-জয়ন্তি)

দাবি করেন–

ভুল আগুনের ফুলটাকে সরায়ে দাও
সূর্যের মতো সত্য আগুনের ফুলটারে ফিরায়ে আনো

যে তোমার
যে আমার
যে তোমাদের
যে আমাদের
(আগুন ফুল)

কিন্তু কবির "স্বপ্নের কুঁড়িগুলি সব মাড়িয়ে গেছে সিন্ধুঘোটক নয় উড়ন্ত রাক্ষসেরা।" *(অনাবর্তন)* তাই এক "দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস" *(বৃত্তাভাস)* হয়েছে কবির নিত্যসঙ্গী। কবি আরশাদ দেশভাগের যন্ত্রণার এক প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ভাল করেই জানেন যে, "বিষদাঁত ছাড়াও মানুষ বিষধর হতে পারে, উন্মত্ত হতে পারে।" *(পরিত্রাণ)* সাক্ষী হয়েছেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালের চড়াই-উৎরাইয়ের। সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শেষ হয়েছে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক সমাজের আচমকা ধসে পড়ায়। এসবই দাগ কেটেছে তাঁর বুকে এবং তাঁকে করেছে তীব্র যন্ত্রণাবিদ্ধ। নিদ্রাভঙ্গ শিশুর মত তাই যেন মাঝরাতে চেঁচিয়ে ওঠেন: "কে হে তুমি, তোমরা? উচ্ছিষ্ট ভোগের আশায় আশায় ক্ষমতার মসনদের কাছে নতজানু। জেনে রেখো রক্তে ভেজা এ মৃত্তিকায় রয়েছে প্রতিরোধের বীজ।" *(অধোগতি)*

এ প্রতিরোধ-বীজের আস্থাই এখনও তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু দেখেন অর্থনীতির "অদৃশ্য হাত গিলে খায় হাট-বাজার, সুপার শপ, বায়োস্কোপ।" *(সোনাবালা)* আর "এরমাঝে রামপাল-বাঁশখালী-চুনারুঘাট-নির্যাতন-বাজেট-ভ্যাট-ট্যাক্স-বাজার দর একের পর এক দৃশ্য সুপার ফাস্ট গতিতে সরে যায়।" *(ক্লাস-সিনড্রোম)* যার পরিণতি হতে পারে এক ভয়ঙ্কর পৃথিবী যেখানে: "নিয়ম ও নিয়তির ফাঁদে মারা পড়বে কিছু বেহুদা মানুষ। সত্যিই কি তারা মানুষ? তাই নিয়ে গবেষণা বরাদ্দ বাড়বে।" *(কোয়ারেন্টিন)*

যন্ত্রণাক্ষুব্ধ ক্রোধে উন্মত্ত কবি তাই প্রাচীন গুহাচিত্রের বাইসনকে আহ্বান করছেন বদলা নেয়ার–ধরিত্রির অসুখ সারাবার। আমরাও এ নব অভিযানে তাকে জানাই সম্মতি–নতুন পৃথিবী গড়বার অঙ্গীকার নিয়ে।

আরশাদ সিদ্দিকীর কবিতায় এক পেলব গতিময়তা আছে যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় আপন শক্তিতে। কবিতার প্রচ্ছন্ন সুর ও সহজ ছন্দোময় চলমানতা তাকে আকৃষ্ট করে। ফলে একরকমের ভাললাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয় সে। এখানেই কবির প্রকৃত শক্তি। ঠিক এইরকম: কেবল আজব্দি আমি তোমার খোলা চুলের জটিল ধাঁধা, না মেলা সরল অঙ্কে বেসামাল হয়ে রইলাম। (অলকদাম) তবে কবির এই শক্তি শূন্য থেকে উৎপন্ন নয়। এর শিকড় নিহিত তাঁর সমাজমনস্কতায়, পরিবর্তনের প্রেরণায় ও সূক্ষ্ম অনুভবে। কবি দেখেছেন বহু স্বপ্নের খুন। তাঁর "স্বপ্ন ছিল লাল নিশানের/ স্বপ্ন ছিল সবুজ ডাঙার/ স্বপ্ন ছিল শেকল ভাঙ্গার/ স্বপ্ন ছিল ঋণ চুকাবার।" যদিও তিনি বলছেন, "স্বপ্নের মৃত্যু এমন কিছু নয়।"

আশরাফ আহমেদের উপন্যাস
একাত্তরের হজমিওয়ালা
নিয়ে কথা

মনিকা জাহান মোহনা

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য সাধনার মৌন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের অসংখ্য বই। বইকে সঙ্গী করতে পারলে মানুষের হৃদয়ের অনেক অভাব ঘুচে যায়। সুতরাং আধুনিক জগতকে উপলব্ধি করতে হলে সভ্য মানুষের বইয়ের অবারিত সঙ্গ না হলে চলে না। তাই পৃথিবীর ইতিহাস-ঐতিহ্যের অন্যতম অবলম্বন বই। বই পড়া মানুষের অন্যতম শখ। বই পড়তে আমিও অনেক ভালোবাসি। আর তা যদি হয় উপন্যাস তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। বই পড়ার প্রতি আমার অনুরাগ অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। আমার বিদ্যালয়ে এ পাঠাগার স্থাপনের ফলে আমিসহ আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা বই পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে ।

"মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার" থেকে ইতোমধ্যে আমি অনেকগুলো উপন্যাসের বই পড়েছি। তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত পছন্দের বই হলো "চাঁদের পাহাড়"।

"মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার" কর্তৃক আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করি। আমি সেখানে একটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই পুরস্কার হিসেবে অর্জন করি। অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা সন্নিকটে থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বইটি আমি পড়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাইনি। তাই, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একদিন বিকেলে বইটি খুলে বসলাম। বইটির নাম হলো "একাত্তরের হজমিওয়ালা"। এমন মজার নাম দেখেই পড়ার আগ্রহ দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেই বিকেলেই বইটি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করলাম। ওইদিনের ওই বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো আমার উক্ত বইটি পড়ার মাধ্যমে।

গল্পটির প্রধান চরিত্র ফুলবানুর মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম। গল্পটিতে ফুলবানু এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বুয়া খালার সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে সে এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনার মুখোমুখি হয়। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সে ভ্রমণ করে ফেলে ঐতিহাসিক ১৯৭১ সাল। রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা সেই ঘটনায় সে দেখতে পায় তৎকালীন যুবক ও তরুণীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্বর অত্যাচার। বর্তমান সময়ের বাসিন্দা হয়েও উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সে চলে যায় মুক্তিযুদ্ধের দিন সংবলিত অতীতে।

আমার পুরস্কারপ্রাপ্ত বইটি পড়ে আমি আরো জানতে পেরেছি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তৎকালীন তরুণদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। গল্পটির দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র অর্থাৎ সেই হজমিওয়ালার সাথে ফুলবানুর অন্যরকম এক সুন্দর বাবা-মেয়ে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই হজমিওয়ালার প্রতি একটি অনাবিল আগ্রহ ফুটে ওঠে। তাই হজমিওয়ালার বিষয়ে গভীরভাবে জানতে গিয়েই ফুলবানু ওই রোমাঞ্চকর ঘটনার সম্মুখীন হয়। গল্পটি পড়তে আমার মনের মধ্যেও সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। ফুলবানু চরিত্রের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করার মাধ্যমে রহস্যময় এবং অত্যুজ্জ্বল ৭১-এ প্রবেশ করে ফেলেছিলাম। বইটি পড়ে সত্যিই আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। 'একাত্তরের হজমিওয়ালা' বইটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতেও আমাকে সহায়তা করেছে।

সর্বোপরি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার এবং উক্ত পাঠাগারের সকল কর্মীদের প্রতি। এর সাথে আশা করছি তারা যেন আমাদের বিদ্যালয়ের এ পাঠাগারে আরো চমকপ্রদ বই যুক্ত করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এত সুন্দর একটি বই আমাকে পুরস্কার হিসেবে প্রদান করার জন্য। বইটি পড়ে আমি সত্যিই অনন্য জ্ঞান লাভ করেছি।

লেখক: শিক্ষার্থী (নবম শ্রেণি), দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনা

নাটোরে সিংড়ায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ

৮ আগস্ট ২০২৩এ নাটোরের সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল ও কলেজে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে সেরা পাঠক-পাঠিকাদের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গোপেন্দ্রনাথ দাসসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপ সিংড়া শাখার ম্যানেজার মোশাররফ হোসেন, শিক্ষা সুপারভাইজার সাবরিনা সুলতানা ও শিসকের সকল শিক্ষিকা, প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কারের পাশাপাশি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সিদীপের পক্ষ থেকে আরও ১০টি বই উপহার দেয়া হয়।

স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন ২০২৩
বিতর্ক প্রতিযোগিতা
বই ও পাঠাগার বিষয়ক আলোচনা
পাঠাগার উদ্যোক্তা সম্মাননা
আবৃত্তি ও গান
কাশিনাথপুর, পাবনা : ১৭ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, শনিবার